যশোদা

আলো রায়

আঙুল দিয়ে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে আমিনা বলল, 'হ্যাঁরে সানু, তগ কিষ্টোঠাকুরের বয়স হইছে কত ক' দিহি।

সানু যথারীতি জবাব দিল না। এই ওর স্বভাব। সহজে কথা বলে না। দিব্যি পাশেই বসে বসে জাম চুষছে। শুনতে পায়নি এমন নয়। তবুও। আসলে কোনো কথা বেশ কয়েকবার না শুনলে ওর মগজে ঢোকে না। রাগ হয়ে আমিনা বেগনের — 'আ মার। ছুড়ির কানে ঠাস নিকি? রা কাড়িস না যে বড়ো?'

আমিনার বয়স হয়েছে। তা প্রায় তিন কুড়ি তো পার হয়েইছে। একটুতেই মেজাজ গরম হয়ে যায় আজকাল। কুঁচকানো কপালে আরও দাগ কেটে বুড়ি চেঁচিয়ে ওঠে, 'বলি কোন লাগরের কথা চিন্তা কর মাইয়া, বইয়া বইয়া। কী জিগাই না জিগাই রাও করো না এক্কেরে।'

গজগজ করে উঠে আমিনা একটা ঠেলা দেয় সানুকে।

বিরক্ত মুখে কোঁচড় থেকে পড়ে যাওয়া জামগুলো কুড়িয়ে তুলতে তুলতে সানু ঝাঁজিয়ে ওঠে, 'তুমি হইলা মোছলমান, আমাগো কিষ্টোঠাকুরের বয়স দিয়া করবা কী? নিকা করবার সাধ হইছে নিকি?'

'তোবা তোবা!' প্রায় কেঁদেই ফেলে আমিনা, 'কী যে কেস, তর মুখের লাগাম নাইরে হারামজাদি।'

আমিনা কেমন উদাস হয়ে বাইরের দিকে তাকায়। ভাঙা বেড়ার ধার দিয়ে কচুর গাছ হয়েছে অনেকগুলো। একটু জল পেলেই তরতরিয়ে উঠবে। পাশেই একটা লঙ্কা গাছ। দু-চারটে লাল শাক। মাটির ভাঙা হাঁড়ি গড়াগড়ি খাচ্ছে। শতচ্ছিন্ন চাল মাথায় নিয়ে যে খোড়ো ঘরে আমিনার শোয়া - বসা তাতে আব্রু ছায়া সবই বাঁচে। ছলছল চোখে আমিনা চোখ ঘোরায়। সানুর দিকে তাকায়। ওর কোনো বিকার নেই। আপনার মনে জামের আঁটি চোষে। আমিনা একটু সামনে এগিয়ে বসে। তাতেই হাঁটুর ব্যথাটা টনটন করে ওঠে। ও কাতরায়, 'সানুরে, আগে করস ক্যান! আগ করস না।' সানু হাসে, 'না গো, আগ করি নাই। আমি তো জানি গিসের দুঃখে তোমার পরান ফাটে।'

সহানুভূতির স্পর্শে আরও রাগ হয়ে যায় আমিনার, 'কী, কী জানস তুই ক' দিহি?'

সানু নির্বিকার। জবাব দেয় না। একরাশ চুষে ফেলা জামের আঁটি, উঠোনময় ছড়ানো ছাগলের নাদি, শুকনো সজনে ডালের টুকরো — বোধহয় চুলো ধরাবার জন্য রাখা, কয়েকটা কচুর পাতা, বেড়ার ধার ঘেঁষে কাঁচা দুর্গন্ধ নর্দমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সানু নাক সিঁটকোয়।

'কী জানস তুই আবাগির বিটি?' আমিনা প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে। সানু উঠে পড়ে। দৌড়ে চলে যাওয়ার আগে চেঁচায়, 'সব জানি... সব।"

কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় আমিনা। আঁতকে ওঠে, 'সানুরে — কইয়া যা, কইয়া যা রে মুখপুড়ি, কী জানস তুই আমারে ক'।'

দূর থেকেই সানু হাসে। বুড়ো আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে চিৎকার করে, 'কমু না, কমু না...।' বলেই পালায়। দূরের বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ঠিক বাগান বলতে যা বোঝায় তা নয়। বেশ বড়োসড়ো জঙ্গলই বলা যায়। অজস্র গাছগাছালি ঝোপেঝাড়ে ভরা। কী নেই এতে! আমলকি বেল আম সব। শাল মহুয়া বটের কমতি নেই। আর আছে নাম না জানা প্রচুর গাছ। শিয়াল ছাড়া অবশ্য আর কোনো জন্তুর দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু সাপ! তেনারা নিশ্চয়ই আছেন। অজানা আশঙ্কায় বুক দুরুদুরু করে আমিনার।

'যাইস না রে সোমত্থ মাইয়া, বনে বাদাড়ে অমন কইরা ঘুরিস না রে হাড়হাভাইত্যা।'

জঙ্গলের বেশ কিছুটা ভেতর থেকে আওয়াজ আসে, 'যামু, যামু, পিরুম না। — কী করবা কইরা ফ্যালাও।'

আমিনা গজগজ করে। অভিশাপ দেয়, 'মর মর হতচ্ছাড়ি।' কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর যেন ভুলেই যায় সব। হোগলার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হাঁটুতে বাতের ব্যথা নিয়ে টুকটুক করে এগোয়।

মুসলমান পাড়ার বাঁ পাশ দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। ওটি পার হয়ে হাত পঞ্চাশেক গেলেই রোগা পাতলা নদী — ঢলানি। এখন চড়া পড়ে গেছে। জল নেই কোথাও। ওপারে প্রথমেই তাঁতিপাড়া, তারপর একটা ছোটো মাঠ ছাড়িয়ে বামুন - বদ্যি - কায়েতদের বসতি। একসময়ের জমিদার চৌধুরী নিবারণচন্দ্র এখনও এ তল্লাটের প্রধান। সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মধুসূদন। বুদ্ধি ভরসা দেবার একমাত্র লোক। চৌধুরীগিন্নি প্রকাণ্ড এক থোকা চাবি আঁচলে বেঁধে একমুখ পান খাওয়া হাসিতে এখনও বরাভয়ে আশ্বস্ত করেন দুঃখী আতুরজনকে।

আমিনা এমনিতেই দুঃখী, তায় সানু তাকে আরও দুঃখ দিয়ে গেল। ভাবলে এখনও বুক কাঁপে। আমিনার হাঁটুও কাঁপে। তবু এগোয়। ও চৌধুরীবাড়ি যাবে।

নটবর ব্যস্তসমস্তভাবে মুনিষ খাটাচ্ছিল। আমিনাকে দেখেই হাঁ হাঁ করে উঠল — 'খাড়াও খাড়াও! বলি যাও কই? দ্যাখতাছো না উঠানে নিকা পরছে — গোবর ল্যাপাইতাছি মুনিষ দিয়া! মাথা খাইছনি চক্ষু দুইটার।'

আমিনা থামে। জুলজুল চোখে তাকায়, বলে, 'ভয় নাই মুছুদ্দির ব্যাটা, পাও রাখুম না ও হ্যানে। মা ঠাউরেন কই আছেন?'

নটবর বিরক্ত হয়। 'খুইজা লও গিয়া। ত্যানার কি ফুরসত আছে এখন। দিক করো ক্যান যখন তখন? পরে আইস।'

আমিনা বিজবিজ করে সরে যায়। 'পরে আসুম ক্যান। পেয়জন যহন, তখন না আইয়া পরে আসনের লাই কও ক্যান মুছুদ্দির ব্যাটা? তোমার কি একটা বিচার নাই — বিবেচনা নাই।'

আমিনা পেছনে বাগানের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। যা ভেবেছিল তাই। গিন্নিমা কাকে যে কী বোঝাচ্ছেন। লোক দুটো প্রবল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছে। ওরা কাজ বুঝে চলে যেতেই গিন্নিমা ফিরলেন। আমিনাকে দেখে বললেন, 'কী গো! আইজ কী মনে কইরা?'

কথা না বলে ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল আমিনা। তারপর হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'মা ঠাউরেন আমার বড়ো দুঃখ।'

প্রাক্তন জমিদারবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রা এসেছে গত মঙ্গলবার। তিনদিন ধরে পালা চলছে। প্রায় চল্লিশ জন লোক। দু-বেলা

চা জলখাবার আর ভাতের ব্যবস্থা করা এদের। হাজার কাজ, লাখ ফ্যাকড়া। মরবাত পুরসত পাওয়া মুশকিল। এ সময়ে ঝুটঝামেলা ভালো লাগে না। তবু ঝামেলা সইতে হয়। সাত গাঁয়ের লোক একবাক্যে বলে, গিন্নিমার দয়ার শরীল!

গিন্নিমা আমিনার দুঃখ ফাঁদার ভূমিকায় বিচলিত হন। আহা বেচারা। 'কও, কী দুঃখ তেমার ।' চৌধুরীগিন্নি শুধান। অনেকটা হিন্দু দেবদেবীদের ভঙ্গিতে।

মনে মনে শিউরে ওঠে আমিনা। দুঃখ কি একটা! হাজারটা! কোনটা ছাড়ি কোনটা কই গিন্নিমা। হেয়া তুমি বোঝবাও না।— মুখে সে কথা বলে না। ইচ্ছে করে হাসে। বলে, 'মা ঠাউরেন, একডা কথা কই?'

'কও না ক্যান?'

'আমি তো মোছলমান।'

'হেতে কী হইছে...।'

'হয় নাই কিছু। বাবুর আমার দয়ার শরীল।'

'কী কবা কও! আমার কাজ আছে।' গিন্নিমা একটু তাড়া দেন।

থতমত খায় আমিনা। তাড়াতাড়ি বলে, 'তোমাদের দালানে যাত্রা হইতাছে না?'

'তাতে হইছেটা কী?' গিন্নিমা এবারে বিরক্তি লুকোন না।

আমিনা ঘাবড়ায়। পাগলের মতো কখন যে কী ভাবে, সব কথা কি সব সুময় বলা যায়, না কওয়া যায়! যাত্রা দলে কৃষ্ণ সাজে যে ছেলেটি তার কথা জিজ্ঞেস করার জন্যেই এসেছে, কিন্তু বেরোয় না মুখ থেকে। গিন্নিমাকে কি জিগানে চলে, মা ঠাউরেন, কিষ্টোঠাকুর সাজে যে পোলাডা, হেয়ার নামডা কী? বয়স হইছে কত ছোঁড়ার? বাড়ি কুথায়? জিগাইলেই গিন্নিমা কইবেন, সে খোঁজে তোমার কী কাম বিবি? —না, বাজে রসিকতা করবেন না চৌধুরীগিন্নি। সে স্বভাবের লোকই না তিনি। তবু মোছলমানের ঘরের মেয়ের হিঁদুর খোঁজে দরকার কী, এই প্রশ্নটা জাগবেই। তাই আমিনা বলে, 'আমি দেখি নাই যাত্রা, কাইল দেখুম। একটুস কত্তারে কইয়া দিয়েন।'

চৌধুরীগিন্নি হাসেন। বলেন,'দ্যাখবাই যদি, আইজই দেইখ্যা ফ্যালাও। সকাল হইতে না হইতেই চইলা যাইব অরা। বায়না আছে অন্য কুনো খানে।'

একটা যেন বাজ পড়ল কোথাও। চোখটা জ্বালা করে উঠল। তারপর খিন্ন স্বরে বলল, 'মাগো, আমারে দুইটা মুড়ি দিবেন।'

'মুড়ি! তা দিমু না ক্যান।' আমিনার দুঃখটা যে এতক্ষণে বুঝতে পারেন গিন্নিমা। খুশিও হন। ঘুরিয়ে - ফিরিয়ে কথা ওঁর একটুও ভলো লাগে না। একটু কষ্টও হয় তাঁর। বেচারা। হয়তো খিদে পেয়েছে। কবেলা খাওয়া হয়নি, কে জানে!

'তুমি খাড়াও, আমি আইনা দিতাছিধ।' মুড়ির সঙ্গে গুড়ও এনে দেন কিছুটা। কোঁচড়ে ভরে নিতে নিতে কৃতজ্ঞ চোখে তাকায় আমিনা।

'কিছু কবা?' —প্রশ্ন করেন গিন্নিমা।

'বড়ো চিন্তা লাগে মা ঠাউরেন—'

'কিসের চিন্তা?'

'সানুডা বড়ো জ্বালায়। কখন জঙ্গলে গিয়ে ঢোকছে, এখনও ফেরে নাই।'

'ফিরবো।' আশ্বাস দেন চৌধুরানি।

'না মা। মাইয়াডা বড়ো ধিঙ্গি হইয়া গ্যাছে আইজকাল। এহানে ওহানে ঘুইরা মরে। আপনে একটুস বইক্যা দিয়েন।' নালিশ জানায় আমিনা।

চৌধুরীগিন্নি হাসে। সানু আমিনার কেউ নয়। জেলেপাড়ার মেয়ে। শরীর বাড়বাড়ন্ত, নইলে কতই বা বয়স! আমিনার দাওয়ায় বসে কুলটা জামটা আঁখটা চিবোয়। জঙ্গলে যাওয়ার পথে আমিনার বাড়িটাই সবশেষে। তাই ওখানেই ক্যাম্প পাতে সানু। আমিনার স্নেহ ওকে ঘিরে থাকে। সেটুকু অজানা নয় চৌধুরীগিন্নির। তাই হাসি পেলেও হাসতে গিয়ে থেমে যান। বলে, 'দিমু, আচ্ছা কইরা বইক্যা দিমু।'

আমিনা এগোয়। ও বাড়ি যাবে।

বাড়ি ফিরেই মনে হল সানু হয়তো ফেরেনি। এই এক জ্বালা হয়েছে। ওর চোদ্দোপুরুষের কেউ নয়। তবু কী যে টান পড়ে গেছে। দু - বেলা না দেখলে ভালো লাগে না। প্রাণটা আঁকুপাঁকু করতে থাকে। আমিনা ঘর খুলে ভেতরে না গিয়ে দাওয়ায় বসল। এদিক - ওদিক চোখ ঘোরাল। ঘোলাটে রঙের বিকেল। প্যাক প্যাক করতে করতে হাঁস দুটো নিজের নিজের খোপে গিয়ে ঢুকল। ওরা শিখে গেছে। পেঁচি আর বুঁচি। ওরা কিন্তু ডিম দেওয়া বন্ধ করেছে অনেকদিন। তবু আছে। সারাদিন টো টো, সন্ধ্যে হলেই ঘরমুখো। আমিনা ফোকলা দাঁতে থুতু ছেটায়, 'আ মর, পাড়াঘুরুনিয়া! বলি এক্কাল গিয়া যে সাতকাল ঠেকছে। যাস কই তরা পিরিত করনের জইন্য।'

হাঁসের খোঁয়াড় বন্ধ করে আমিনা ঘরে উঠল। একটা সানকিতে মুড়িগুলো ঢালল। গুড় রাখল অন্য একটা পাত্রে। মাটির কলসিতে জল ছিল। বদনায় ঢেলে বাইরে এলে আর অমনি দেখল বিকেলের পড়ন্ত রোদে লম্বা এক ছায়া তার উঠোনের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে।

'যায় কেডা — ?' শুধাল আমিনা।

ছায়াটা থমকাল। তারপর ফিরে দাঁড়াল।

'আমি গো — লবো। লবোমোহন।'

আমিনা দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে বছর সাতাশের একটি স্বাস্থ্যবান যুবক। বড়ো চোখ। বড়ো চুল। টিকালো নাক। একমুখ হাসি নিয়ে লোকটা আবার বলল, 'আমি লবো।'

আমিনা হাঁ করে থাকল। তারপর বলল, 'এহানে আসো।'

লোকটি আপত্তি করল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

'লতুন মনে হইত্যাছে। যাতরাপাটিতে কাম কর নিকি?'

‘হ্যাঁ গো।’ মিষ্টি করে হাসল লোকটা। গলার স্বরটা মিষ্টি অথচ ভরাট। ‘কৃষ্ণ সাজি।’ আমিনা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ‘খাড়াও খাড়াও! আমি একটা চাটাই লইয়া আসি। একটুস বইস্যা যাও!’

‘ না গো — আজ আর বসুম না। কাম আছে।’

‘কাম আবার কিসের?’

‘আছে আছে, হেয়া তুমি বোঝবা না। আমি একডা জিনিস খোঁজতাছি।’

‘ঠাকুর! গরিব মোছলমানের দাওয়ায় তুমি বসবা না — আমি জানি।’

কৃষ্ণ অমায়িক হাসল। ‘আমারে তুমি ভুল বোঝতাছো। আমি ভগবানের পাট করি। ভগমানের অত বিচার নাই। সত্যি কই, কাম আছে।’

‘এই দিক দিয়া কইথন যাইতাছ?’ আমিনা ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

‘ওই জঙ্গলে একবার যামু।’

‘জঙ্গলে! ক্যান?’ বিস্মিত হয় আমিনা। জবার দেয় না লবো। হাসিমুখি বলে, ‘যাই গো! বেলা পইড়া অসত্যাছে।’

‘ওই জঙ্গলে এহন যাইয়ো না বাপ।’

‘ক্যান?’ — যেতে যেতেই বলে লবো।

‘শিয়াল আছে। বুনো। জংলি।’

‘ডরাই না শিয়ালরে।’

‘সাপ আছে, বিষধর, কুলোপানা চক্কর।’

‘সাপেরে ডরাই না গো—’ লোকটা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। হাসছে। বোধহয় ভাবছে, আচ্ছা অভিভাবকের পাল্লায় পড়া গেছে।

তখন আমিনা বলল, ‘ঠাকুর, একটুস শুইন্যা যাও।’

‘কী কবা কও। ঝট কইরা কও। কাম আছে।’ লোকটা ওখানেই দাঁড়াল।

‘ঘরে মুড়ি আছে, গুড় আছে। খাবা?’

‘না গো, এহন খামু না। রানিমা প্যাট ভইরা খাওযাইয়া দিছে।’ বলেই লবোর হয়তো মনে হল, ঠিক হল না বলাটা। আহা। বুড়ি মানুষ। কত স্নেহ করে খেতে দিতে চেয়েছে দুটি। আবার বলল, ‘আগ কইরো না গো। প্যাটে গাদন থাকলে গান গাইতে দিক লাগে। সুর বাইরয় না। রাইতে গাইতে লাগব।’

‘তয় এক মার করি,’ আমিনা তবু ছাড়ে না, ‘দুইটা মোয়া বানাইয়া রাখি। ফেরনের পথে লইয়া যাবা। সাতসকালে চইল্যা যাইত্যাছ। পথে খিদা লাগব। দিমু বানাইয়া?’ অনুনয়ে আমিনা প্রায় ঝুঁকে পড়ে।

মন গলে যায় লবোর। দুঃখী মানুষ মনে হইত্যাছে। স্তোক দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, ‘বানাইয়া রাইখ। এহান দিয়া যদি ফিরি, লইয়া যামু।’

ও আর দাঁড়ায় না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

আমিনা ভাবল, লোকটা শিয়ালরে ডরায় না, সাপরে ডরায় না, তো ডরায় কিসে? কিষ্টোঠাকুর! সানুরে ডরাও? মনে মনে প্রস্ন করেই চমকে উঠল আমিনা। মনে পড়ল সানু এখনও ফেরেনি। সে-ও একটা চিনচিন ব্যথা। হাঁটু কনকন করছে। তবু আমিনা উঠল। শুনতে পাক আর না পাক তবু চেঁচাল, ‘জঙ্গলে যাইস না বাপ আমার। ফির‍্যা আয়।’ ওহানে যে সানু আছে।

লোকটা জঙ্গলে হারিয়ে গেল।

প্রথম যখন চকা ভাঙল তখন আকাশের চাঁদ পশ্চিমে ঢলেছে। পূর্ণিমা। ঢলানির বালুতে জ্যোৎস্না থিকথিক করছে। দু-একটা কাক এখনও মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। আমিনার মনে হল হাতের আঙুলে একটা যন্ত্রণা। দেখল, একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে আঙুলের ডগা কামড়ে ধরেছে। পাশেই একটা শালপাতার তোনায় দুটি মোয়া। তাতেও পিঁপড়ে ধরেছে। আমিনা আর একটা হাত দিয়ে পিঁপড়েটা ছাড়াতে গিয়ে দেখল ওঠাতে পারছে না। বুকটা কেমন ভারী। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। পা নাড়াতে গেল, নড়ল না। ও দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে। শুধু নড়াচড়া ক্ষমতা নেই। মনে হল ডুকুরে কেঁদে ওঠে। ‘তা অইলে কি ইন্তেকালের সুমায় হইছে?’ অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে নদীর দিকে চাইছে মনে হল নদীতে প্রচুর জল। বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে, নামছে, বাঁধানো ঘাট, অনেক লোকজন। একটা খুব বড়ো নৌকা বাঁধা। যাত্রাপার্টি চলে যাচ্ছে। ওই তো লবো! ও বোধহয় দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই তো বড়ো বড়ো পায়ে এগিয়ে আসছে।

‘কী গো! শুইয়া আছ যে বড়ো! আমাগো বিদায় দিতে আসলা না?’

‘কী কইরা যামু কও! গতর লড়ে না। তোমার লাইগ্যা মোয়া বানাইয়া রাখছিলাম, তুমি তো আসলা না!’

‘সুমায় পাই নাইগো। এহন আছে?’

‘হ। কিন্তু পিপড়া ধইর‍্যা গেছে। ঝাইড়া লইও।’

‘লমু’। হাত বাড়াল লবো।

‘একডা কথা কই।’

‘কও।’

‘কী খোঁজতাছিলা যেন। হেইডা পাইছ?’

‘কমু ক্যান?’ হাসে লবো।

‘কবা না? খুঁইজা পাইছ কি না, কবা না?’

‘না, কমু না। কইলে পাওনের জিনিস আবার হারাইয়া ফ্যালাই যদি?’

‘কইয়া ফ্যালাইলে আবার পাওনের জিনিস হারাইয়া যায় বুঝি?’

‘যায়ই তো।’

‘তা অইলে কইয়ো না। কিন্তুক একডা কথার জবাব দিয়া যাও।’

‘কী কথা?’

‘সানুরে দেখছিলা জঙ্গুলের মধ্যে?’

‘সানু? কেডা সানু?’

‘লজাইও না। কও না, দেখছিলা?’

‘কমু না।’ ইষৎ লজ্জিত স্বরে বলল লবো। তারপর ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল।

‘যাই গিয়া। লাও ছাড়ে।’ লবো ছুটে গিয়ে নৌকায় চাপল।

আকাশের দিকে তাকাল আমিনা। মেঘ জমেছে মনে হচ্ছে এক কোনায়। কালো ভারী মেঘ। চাঁদ একটু পরেই ঢাকা পড়ে যাবে। থমথমে ভাব। ঝড় উঠবে। বৈশাখের প্রথম ঝড়। কোনোরকমে দোনায় রাখা মোয়া দুটির দিকে তাকাল আমিনা। ছানি পড়া চোখে ঠিক ঠাহর হল না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। মুড়িগুলো সচল হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। মুড়ি না পিঁপড়ে! — ‘খা খা, তরাই খা।’

শরীরটা একটুও নড়ছে না। ঘাড় ভেঙে আসছে।

সাবধান! সবাধানে যাইয়ো কিষ্টোঠাকুর! ম্যাঘ জমছে। ঝড় উইঠ্যা পড়লে খুব সাবধান! ঢালানিতে ঢল নামলে সব্বোনাশ।

কাউরে কই নাই রে, আসল কথাডা কাউরে কই নাই। তুমি নিশ্চিন্তি চইলা যা রে। খুঁইজা পাইলে কইতে নাই। খোঁজনের জিনিস আবার হারাইয়া যায়!

সাবধান — সাবধান ! বদর বদর — হারু রে ... ...!

একটু পরেই আকাশ কালো হয়ে এল কিংবা আমিনার চোখ নজর হারাল। মস্তিষ্কের কোষে কোষে অসংখ্যা পিঁপড়ের কামড়ের জ্বালা নিয়ে আমিনা শেষবারের মতো ভাবল — আল্লা মিঞা গো। একবার সানুরে পাঠাইয়া দাও। আরে জিগামু, সানু, লজাইস না, ডরাইস না, কাউরে কমু না, শুধু তুই আমারে কইয়া যা — তগ ওই কিষ্টোঠাকুর তরে খুঁইজ্যা পাইছে! তগ ওই কিষ্টোঠাকুরের বুকডা একবার হাতাইয়া দেখছসনি হারামজাদি। ওহানে হাতে কিছু ঠ্যাকে নাই? একটা পদ্মকুঁড়ি? লাল টুকটুইক্যা? ছোটোবেলায় হারুর বাপের বড্ড শখ আছিল পোলার বুকে ফুল আঁইক্যা দিবো। দিছিল। মেলায় গিয়া নগদ চার গণ্ডা পয়সা খর্চা কইরা উল্কি পরাইয়া আনছিল। তুই দেখছস! সত্যি কথা ক’! কমু না রে — কাউরে কমু না। আল্লামিঞা, একবার সানুরে পাঠাও! আরে আসল কথাডা জিগাই একবার।

সানু সব জানে!